

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০২৩ প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

মোঃ রেজুয়ান খান

১১ ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস। মানুষের জীবনে পর্বতের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের এক চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি প্রায় ২৭ শতাংশ জায়গা জুড়ে আছে বিস্তৃত পর্বতমালা। এ পর্বতমালা থেকে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন পৃথিবীর ২২ শতাংশ মানুষ। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ পর্বত হতে আহরিত সম্পদ দ্বারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছে।

পাহাড়কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার কৌশল হিসেবে সারাবিশ্বে পর্বত দিবস পালিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিকভাবে পর্বত দিবস উদযাপন করা বেশিদিন আগের কথা নয়। যতদূর জানা যায়, ১৮৩৮ সালে পর্বত দিবস প্রথম পালন করার আভাস পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট হোলিওক কলেজের ছাত্ররা ঐ অঞ্চলের পর্বতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ক্লাস বর্জন করে হোলিওক পর্বতের দিকে যাত্রা শুরু করে। পরে ১৮৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথ কলেজ পর্বত দিবস উদযাপন করে। যুক্তরাষ্ট্রের জুনিয়োতা কলেজ তাদের পর্বত দিবসের ঘোষণা দেয় ১৮৯৬ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এমনিভাবে তাদের পর্বত দিবস পালন করা শুরু করে। জনজীবনে পাহাড়ের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা অনুধাবন করে ২০০২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রতিবছর ১১ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস’ হিসেবে পালন করার ঘোষণা হয়। সেই প্রথম ২০০৩ সালের ১১ ডিসেম্বর সারা পৃথিবীতে ‘আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস’ পালিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবসটি পালন করে আসছে। প্রতিবছর দিবসটির গুরুত্বকে অনুধাবন করে একটি থিম নির্ধারিত হয়ে থাকে।

এবারের ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের থিম “Restoring mountain ecosystems” ‘পর্বত ইকোসিস্টেম পুনরুদ্ধার করা’ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। Ecosystem সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হচ্ছে- জৈব, অজৈব পদার্থ ও বিভিন্ন জীবসম্বন্ধিত এমন প্রাকৃতিক একক যেখানে বিভিন্ন জীবসমষ্টি পরস্পরের সাথে এবং তাদের পারিপার্শ্বিক জৈব ও অজৈব উপাদানের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জীবনধারা গড়ে তোলা। এ ধরনের জীব ও তার পরিবেশের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠা উপাদানকে বাস্তুবিদ্যা বা Ecology বলে। আর Restoring মানে পুনরুদ্ধার করা।

২০২১-২০৩০ এই এক দশকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির আওতাধীন পর্বতগুলোকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতিপাদ্য হিসেবে “Restoring mountain ecosystems” নির্বাচন করা হয়েছে। রাজনৈতিক সমর্থন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আর্থিক সংস্থানগুলির সমন্বয়ে এই এক দশকে পর্বতগুলোকে বাস্তুগতরূপে পুনরুদ্ধার করার একটি প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

জীবজগতের এক বৃহৎ পরিসরের সবুজ ও বাহারি গাছপালা, বিভিন্ন প্রজাতি এবং বিভিন্ন ভাষা, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিগতভাবে বিচিত্র সম্প্রদায়ের মানুষ পর্বতগুলোর আশেপাশে বসতি স্থাপন করে জীববৈচিত্র্যতা গড়ে তুলে প্রকৃতসৃষ্ট পর্বতগুলোকে যেন মিতালীর বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছে। বিশ্বের জীববৈচিত্র্যময় হটস্পটগুলির প্রায় অর্ধেকই এই পর্বতরাশি। বিশ্বের অর্ধেক মানুষ পর্বত থেকে মিঠা পানি পেয়ে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীতে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব, বৃক্ষরাজি ধ্বংস, পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, জনসংখ্যার আধিক্য, অপরিবর্তনীয় শিল্পায়ন ও নগরায়ণ এবং পর্বতের তুষার ও ভূমিক্ষয়সহ নানা ক্ষয়ের কারণে প্রকৃতি ও পরিবেশ মারাত্মক বিপদের মুখে পড়ে প্রকৃতসৃষ্ট পর্বতগুলো হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পর্বতগুলোর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে প্রায়শ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাহত হচ্ছে। যার দরুন মানুষকে প্রতিনিয়ত জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলা করতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন পানির প্রবাহকে হুমকির মুখে ফেলেছে এবং দ্রুত ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা পাহাড়ের বিভিন্ন প্রজাতি এবং এই বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল মানুষদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে বাধ্য করছে। বসতি বা অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা, পর্বতের খাড়া ঢালে কৃষিকাজ করায় প্রতিনিয়ত মাটির ক্ষয় হচ্ছে এবং এর ফলে পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে ওঠা বাসস্থলগুলো প্রায়শই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাটি অবক্ষয়ের কারণে নিচের দিকে প্রবাহিত পানির গুণমানকে বিনষ্ট করছে। এভাবে ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকলে পাহাড়ি উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাবে এবং স্থানীয় পর্বত প্রজাতির প্রায় ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত বিলুপ্তির মুখোমুখি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যা পৃথিবীর পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

২০২২-২০৩০ সালের মধ্যে “Restoring mountain ecosystems” (‘পর্বত ইকোসিস্টেম পুনরুদ্ধার করা’) এর মাধ্যমে পাহাড়ের ল্যান্ডস্কেপগুলিকে পুনরুজ্জীবিত এবং রক্ষা করাসহ পৃথিবীর ৩০ শতাংশ ভূমি, মহাসাগর, উপকূলীয় অঞ্চল এবং অভ্যন্তরীণ পানি রক্ষা করার মতো আশা সঞ্চারের ইচ্ছা দিচ্ছে। জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সরবরাহ পরিষেবা থেকে শুরু করে মাটি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ পর্যন্ত, পর্বতগুলি আমাদের জীবন এবং জীবিকার অবলম্বন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদও সম্প্রতি টেকসই পর্বত উন্নয়নের ত্রিবার্ষিক রেজোলিউশনে ২০২৩-২০২৭ “পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে পাঁচ বছরের কর্মসূচি” ঘোষণা করেছে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো পাহাড়ের জন্য অনুদান সহায়তা এবং বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা, “সবুজ” অর্থনীতি

এবং প্রযুক্তির বিকাশ, পার্বত্য দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার প্রক্রিয়া তৈরি করা এবং টেকসই পর্বত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও শিক্ষার বিকাশ ঘটানো এ কর্মসূচির একটি উদ্দেশ্য।

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘিরে রেখেছে। এই পাহাড়ি প্রকৃতির মাঝে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবন সংস্কৃতি ও কৃষ্টি স্বমহিমায় অনন্য করে তুলেছে। বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের পাহাড়ি মানুষের জীবমান উন্নয়নে ও পার্বত্য প্রতিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর আওতায় রয়েছে ভিলেজ কমন ফরেস্টগুলো সংরক্ষণ করা, রিজার্ভ ফরেস্ট ও প্রটেক্টেড ফরেস্ট বৃদ্ধি করা, ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট গড়ে তোলা, বনের ওপর নির্ভরশীল অধিবাসীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিতে এসব কর্মসূচি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। সরকার পার্বত্য তিন জেলার ২৬টি উপজেলায় বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। কমিউনিটি সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে পাড়াকেন্দ্র, ছাত্র হোস্টেল, অনাথ আশ্রমকেন্দ্র ও এতিমখানা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধা, টেলিযোগাযোগ সুবিধা সহজলভ্য করা হয়েছে। পাহাড়ি সাধারণ মানুষ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, সেনিটেশন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সেবা বৃদ্ধির ফলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনমানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। পার্বত্য এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন ও পর্যটন প্রসারে সরকার ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় ০৪টি পর্যটন স্পটের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা দেশের অন্যতম পর্যটন এলাকা হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন আর পশ্চাৎপদ অঞ্চল নয়, বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় এটি এখন উন্নয়নশীল জনপদ, যা দর্শনীয় পর্যটন স্থলে পরিণত হয়েছে। আর এসব সম্ভব হয়েছে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তি চুক্তির বদৌলতে।

#

লেখক: তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার